চৈতালি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : কাব্যগ্রন্থাবলী : ১৩০৩ আশ্বিন

পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫১ মাঘ, ১৩৫৩ পৌষ

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচনা

নদীর প্রবাহের এক ধারে সামান্য একটা ভাঙা ডাল আটকা পড়েছিল। সেইটেতে ঘোলা জল থেকে পলি ছেঁকে নিতে লাগল। সেইখানে ক্রমে একটা দ্বীপ জমিয়ে তুললে। ভেসে-আসা নানা-কিছু অবান্তর জিনিস দল বাঁধল সেখানে, শৈবাল ঘন হয়ে সেখানে ঠেকল এসে, মাছ পেল আশ্রয়, এক পায়ে বক রইল দাঁড়িয়ে শিকারের লোভে ; খানিকটুকু সীমানা নিয়ে একটা অভাবিত দৃশ্য জেগে উঠল, তার সঙ্গে চারদিকের বিশেষ মিল নেই। চৈতালি তেমনি একটুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে-রূপ নিয়ে, অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আবির্ভাব হল।

পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ ; অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্যখেত ধূ ধূ করছে। কোনো-এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ

দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার-প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি, মন যখন বলে, এটাই যথেষ্ট, তখন তার উপরে রঙ লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এইজন্যেই।

এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ, সেগুলি যাকে বলে লিরিক।

আমার অল্পবয়সের লেখাগুলিকে একদিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেম। তখন আমার মনে ছিল, আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই, ঐ দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে, অন্তরে আমি গান গাই। চৈতালিতে অনেক কবিতা দেখতে পাই যাতে গানের বেদনা আছে কিন্তু গানের রূপ নেই। কেননা, তখন যে-আঙ্গিকে আমার লেখনীকে পেয়ে বসেছিল তাতে গানের রস যদি বা নামে, গানের সুর জায়গা পায় না।

রবীন্দ্র-রচনাবলী
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

চৈতালি

চৈতালি

প্রথম ছত্রের সূচী

চৈতালি

চৈতালি

চৈতালি

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর, — পরান-বল্লভ,
তোমার কোমলকান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবন তরীতে, —
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

উৎসর্গ

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে,
  গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্তে ই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
  নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল ;
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
  থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

তুমি এস নিকুঞ্জনিবাসে,
  এস মোর সার্থকসাধন।
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
  বসন্তের সর্বসমর্পণ ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
  বনের বেদন-নিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
  ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি।
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
  খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি ;
তব ওষ্ঠে দশনদংশনে
  টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
  গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্মরনিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
  কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
  পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল।

১৩ চৈত্র, ১৩০২

গীতহীন

চলে গেছে মোর বীণাপাণি।
কতদিন হল সে, না জানি।
কী জানি কী অনাদরে বিস্মৃত ধূলির 'পরে
ফেলে রেখে গেছে বীণাখানি।
ফুটেছে কুসুমরাজি— নিখিল জগতে আজি
আসিয়াছে গাহিবার দিন;
মুখরিত দশদিক, অশ্রান্ত পাগল পিক,
উচ্ছ্বসিত বসন্তবিপিন।
বাজিয়া উঠেছে ব্যথা, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
মনে ভরি উঠে কত বাণী;
বসে আছি সারাদিন গীতিহীন স্তুতিহীন—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

আর সে নবীন সুরে বীণা উঠিবে না পুরে,
বাজিবে না পুরানো রাগিণী;
যৌবনে যোগিনী-মতো লয়ে নিত্য মৌনব্রত
তুই বীণা রবি উদাসিনী।
কে বসিবে এ আসনে মানসকমলবনে,
কার কোলে দিব তোরে আনি—

থাক্ পড়ে ওইখানে চাহিয়া আকাশপানে—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

কখনো মনের ভুলে যদি এরে লই তুলে
বাজে বুকে বাজাইতে বীণা ;
যদিও নিখিল ধরা বসন্তে সংগীতে ভরা,
তবু আজি গাহিতে পারি না।
কথা আজি কথাসার, সুর তাহে নাহি আর,
গাঁথা ছন্দ বৃথা ব'লে মানি—
অশ্রুজলে ভরা প্রাণ, নাহি তাহে কলতান—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

ভাবিতাম সুরে বাঁধা এ বীণা আমারি সাধা,
এ আমার দেবতার বর ;
এ আমারি প্রাণ হতে মন্ত্রভরা সুধাস্রোতে
পেয়েছে অক্ষয় গীতস্বর।
একদিন সন্ধ্যালোকে অশ্রুজল ভরি চোখে
বক্ষে এরে লইলাম টানি—
আর না বাজিতে চায়— তখনি বুঝিনু, হায়
চলে গেছে মোর বীণাপাণি।

১৩ চৈত্র, ১৩০২

স্বপ্ন

কাল রাতে দেখিনু স্বপন—
দেবতা-আশিস-সম শিয়রে সে বসি মম
মুখে রাখি করুণ-নয়ন
কোমল অঙ্গুলি শিরে বুলাইছে ধীরে ধীরে
সুধামাখা প্রিয়পরশন—
কাল রাতে হেরিনু স্বপন।

হেরি সেই মুখপানে বেদনা ভরিল প্রাণে
দুই চক্ষু জলে ছলছলি—
বুকভরা অভিমান আলোড়িয়া মর্মস্থান
কণ্ঠে যেন উঠিল উছলি।
সে শুধু আকুল চোখে নীরবে গভীর শোকে
শুধাইল, "কী হয়েছে তোর।"
কী বলিতে গিয়ে প্রাণ ফেটে হল শতখান,
তখনি ভাঙিল ঘুমঘোর।

অন্ধকার নিশীথিনী ঘুমাইছে একাকিনী,
অরণ্যে উঠিছে ঝিল্লিস্বর ;

বাতায়নে ধ্রুবতারা চেয়ে আছে নিদ্রাহারা,
নতনেত্রে গনিছে প্রহর।
দীপনির্বাপিত ঘরে শুয়ে শূন্য শয্যা'পরে
ভাবিতে লাগিনু কতক্ষণ—
শিথানে মাথাটি থুয়ে সেও একা শুয়ে শুয়ে
কী জানি কী হেরিছে স্বপন,
দ্বিপ্রহরা যামিনী যখন।

১৪ চৈত্র, ১৩০২

আশার সীমা

সকল আকাশ,   সকল বাতাস,
সকল শ্যামল ধরা,
সকল কান্তি,   সকল শান্তি
সন্ধ্যাগগন-ভরা,
যত কিছু সুখ,   যত সুধামুখ,
যত মধুমাখা হাসি,
যত নব নব   বিলাসবিভব
প্রমোদমদিরারাশি,
সকল পৃথ্বী,   সকল কীর্তি,
সকল অর্ঘ্যভার,
বিশ্বমথন   সকল যতন,
সকল রতনহার—
সব পাই যদি   তবু নিরবধি
আরো পেতে চায় মন।
যদি তারে পাই   তবে শুধু চাই
একখানি গৃহকোণ।

১৪ চৈত্র, ১৩০২

দেবতার বিদায়

দেবতামন্দিরমাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে, "গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া ক'রে দেহো মোরে ঠাঁই।"
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল "চলিলাম"— চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু, মোরে কী ছল ছলিলে।"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

১৪ চৈত্র, ১৩০২

পুণ্যের হিসাব

সাধু যবে স্বর্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি
কহিলেন, "আনো মোর পুণ্যের হিসাব।"
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সম্মুখেতে রাখি
দেখিতে লাগিল তার মুখের কী ভাব।
সাধু কহে চমকিয়া, "মহা ভুল এ কী।
প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছে আঁকে,
শেষের পাতায় এ যে সব শূন্য দেখি।
যতদিন ডুবে ছিনু সংসারের পাঁকে
ততদিন এত পুণ্য কোথা হতে আসে।"
শুনি কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে।
সাধু মহা রেগে বলে, "যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা-খাতে।"
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে, "বড়ো শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।"

১৪ চৈত্র, ১৩০২

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে।"
দেবতা কহিলা, "আমি।"— শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা।"
দেবতা কহিলা, "আমি।"— কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা, প্রভু।"
দেবতা কহিল, "হেথা।"— শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি—
দেবতা কহিল, "ফির।"— শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

১৪ চৈত্র, ১৩০২

মধ্যাহ্ন

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যামশষ্প তটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্কতৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ— চলে যায় বহু দূর।

থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বারব,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য'পরে
চিলের সুতীব্র ধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত শব্দ বাঁধা তরণীর— মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।
প্রবাসবিরহদুঃখ মনে নাহি বাজে ;
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল-পরে— ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে— জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

চৈত্র, ১৩০২

পল্লীগ্রামে

হেথায় তাহারে পাই কাছে—
যত কাছে ধরাতল, যত কাছে ফুলফল,
যত কাছে বায়ুজল আছে।
যেমন পাখির গান, যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশিরনির্মলা উষা,
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশতল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর, বটচ্ছায়া অটবীর,
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি ;
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্মস্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।

১৬ চৈত্র, ১৩০২

সামান্য লোক

সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে, বোঝা বহি শিরে,
নদীতীরে পল্লীবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোনোমতে
মন্ত্রবলে অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে
এই চাষি দেখা দেয় হয়ে মূর্তিমান,
এই লাঠি কাঁখে লয়ে, বিস্মিত নয়ান—
চারিদিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতি কথা।
তার সুখদুঃখ যত, তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়াপ্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার খেত, তার গোরু, তার চাষবাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবে না আশ।
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

৭ চৈত্র, ১৩০২

প্রভাত

নির্মল তরুণ উষা, শীতল সমীর ,
শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদীনীর।
এখনো নামে নি জলে রাজহাঁসগুলি,
এখনো ছাড়ে নি নৌকা সাদা পাল তুলি।
এখনো গ্রামের বধূ আসে নাই ঘাটে ;
চাষি নাহি চলে পথে, গোরু নাই মাঠে।
আমি শুধু একা বসি মুক্ত বাতায়নে
তপ্ত ভাল পাতিয়াছি উদার গগনে।
বাতাস সোহাগস্পর্শ বুলাইছে কেশে,
প্রসন্ন কিরণখানি মুখে পড়ে এসে।
পাখির আনন্দগান দশ দিক হতে
দুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে।
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

১১ চৈত্র, ১৩০২

দুর্লভ জন্ম

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন'পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এইমতো পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগৎ'পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।
সে-কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়;
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাই নি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও—
তুচ্ছ ব'লে যা চাই নি তাই মোরে দাও।

১৮ চৈত্র, ১৩০২

খেয়া

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ ;
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস ;
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে, কে বা জানে নাম,
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে কেহ আসে ঘর হতে।

১৮ চৈত্র, ১৩০২

৩

কর্ম

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে।
দুয়ার রয়েছে খোলা,   স্নানজল নাই তোলা,
মূর্খাধম আসে নাই রাতে।
মোর ধৌত বস্ত্রখানি   কোথা আছে নাহি জানি,
কোথা আহারের আয়োজন।
বাজিয়া যেতেছে ঘড়ি,   বসে আছি রাগ করি,
দেখা পেলে করিব শাসন।
বেলা হলে অবশেষে   প্রণাম করিল এসে,
দাঁড়াইল করি করজোড়।
আমি তারে রোষভরে   কহিলাম, "দূর হ রে,
দেখিতে চাহি নে মুখ তোর।"
শুনিয়া মূঢ়ের মতো   ক্ষণকাল বাক্যহত
মুখে মোর রহিল সে চেয়ে ;
কহিল গদ্‌গদস্বরে,   "কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোটো মেয়ে।"
এত কহি ত্বরা করি   গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্য কাজে গেল সে একাকী।
প্রতি দিবসের মতো   ঘষামাজা মোছা কত,
কোনো কর্ম রহিল না বাকি।

১৮ চৈত্র, ১৩০২

বনে ও রাজ্যে

সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন'পরে
সন্ধ্যায় পশিলা রাম শয়নের ঘরে।
শয্যার আধেক অংশ শূন্য বহুকাল,
তারি 'পরে রাখিলেন পরিশ্রান্ত ভাল ;
দেবশূন্য দেবালয়ে ভক্তের মতন
বসিলেন ভূমি'পরে সজল নয়ন,
কহিলেন নতজানু কাতর নিশ্বাসে,
"যতদিন দীন হীন ছিনু বনবাসে
নাহি ছিল স্বর্ণমণিমাণিক্যমুকতা,
তুমি সদা ছিলে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দেবতা।
আজি আমি রাজ্যেশ্বর, তুমি নাই আর,
আছে স্বর্ণমাণিক্যের প্রতিমা তোমার।
নিত্যসুখ দীনবেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে।"

১৯ চৈত্র, ১৩০২

সভ্যতার প্রতি

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার—
পরানে স্পর্শিতে চাই, ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

১৯ চৈত্র, ১৩০২

বন

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা ;
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র ; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণগাথা ; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননীবক্ষের ; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশুসনে ; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।

১৯ চৈত্র, ১৩০২

তপোবন

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পুরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে,
অশ্ব রথ দূরে বাঁধি, যায় নতশিরে
গুরুর মন্ত্রণা-লাগি— স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্বকেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

১৯ চৈত্র, ১৩০২

প্রাচীন ভারত

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধতললাট—
স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তীর বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টংকারে,
বীণার সংগীত আর নূপুরঝংকারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্নাদ শঙ্খের গর্জে, বিজয়-উল্লাসে,
রথে ঘর্ঘরমন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্মকলরোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার—
নির্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

১ শ্রাবণ, ১৩০৩

ঋতুসংহার

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্যসিংহাসন'পরে।
মরকতপাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা ; সমস্ত গগন
স্বর্ণরাজছত্র ঊর্ধ্বে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে ; ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি,
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে— ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী—
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

২০ চৈত্র, ১৩০২

মেঘদূত

নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ।
ঊর্ধ্ব হতে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন ; মিলনের মরীচিকা
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়াকুহেলিকা
খররৌদ্রকরে   হয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গযবনিকা—
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা,
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।
দেখা দিল চারিদিকে পর্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম ; বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

২১ চৈত্র, ১৩০২

দিদি

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা ; কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে ; আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার ; পিত্তলকঙ্কণ
পিতলের থালি'পরে বাজে ঠন্ ঠন্ ;
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন— তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে
স্থিরধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে,
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।

২১ চৈত্র, ১৩০২

পরিচয়

একদিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলি'পরে বসে আছে পা দুখানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমললোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদীতীরে-তীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ-চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে উঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘটি ফেলে ছুটে চ'লে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু— দিদি মাঝে প'ড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে।

২১ চৈত্র, ১৩০২

অনন্ত পথে

বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন—
ছোটো মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন,
গম্ভীর কর্তব্যরত, তৎপর-চরণে
আসে যায় নিত্যকাজে ; অশ্রুভরা মনে
ওর মুখপানে চেয়ে হাসি স্নেহভরে।
আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে ;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম-অবসানে
আপন স্বদেশে ; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানি নে ওরে ; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি।
কোন্ অজানিত গ্রামে কোন্ দূরদেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে,
তার পরে সব শেষ— তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায়।

২১ চৈত্র, ১৩০২

ক্ষণমিলন

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তাঁর আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়,
তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায়।
দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখি পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে।
এ ক্ষণমিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
মুহূর্ত-আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত মম

২২ চৈত্র, ১৩০২

প্রেম

নিবিড়তিমির নিশা, অসীম কান্তার,
লক্ষ দিকে লক্ষ জন হইতেছে পার।
অন্ধকারে অভিসার, কোন্ পথপানে,
কার তরে, পান্থ তাহা আপনি না জানে।
শুধু মনে হয়, চিরজীবনের সুখ
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ।
কত স্পর্শ, কত গন্ধ, কত শব্দ গান,
কাছ দিয়ে চলে যায় শিহরিয়া প্রাণ।
দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো;
তাহারে ডাকিয়া বলি— ধন্য এ জীবন,
তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ।
অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে,
জানিতে পারি নে তারা আছে কি না আছে।

২২ চৈত্র, ১৩০২

পুঁটু

চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে না চাহে।
তৃষাতুরা বসুন্ধরা দিবসের দাহে।
হেনকালে শুনিলাম, বাহিরে কোথায়
কে ডাকিল দূর হতে, "পুঁটুরানী, আয়।"
জনশূন্য নদীতটে তপ্ত দ্বিপ্রহরে
কৌতূহল জাগি উঠে স্নেহকণ্ঠস্বরে।
গ্রন্থখানি বন্ধ করি উঠিলাম ধীরে,
দুয়ার করিয়া ফাঁক দেখিনু বাহিরে।
মহিষ বৃহৎকায় কাদামাখা গায়ে
স্নিগ্ধনেত্রে নদীতীরে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
যুবক নামিয়া জলে ডাকিছে তাহায়
স্নান করিবার তরে, "পুঁটুরানী, আয়।"
হেরি সে যুবারে, হেরি পুঁটুরানী তারি,
মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধ সুধাবারি।

২৩ চৈত্র, ১৩০২

হৃদয়ধর্ম

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।
মধ্যদিনে দগ্ধদেহে ঝাঁপ দিয়ে নীরে
'মা' বলে সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।
যে-সকল তরুলতা রচি উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে, তারা ভাইবোন।
যে পশুরে জন্ম হতে আপনার জানি,
হৃদয় আপনি তারে ডাকে 'পুঁটুরানী'।
বুদ্ধি শুনে হেসে ওঠে ; বলে, কী মূঢ়তা।
হৃদয় লজ্জায় ঢাকে হৃদয়ের কথা।

১ শ্রাবণ, ১৩০৩

মিলনদৃশ্য

হেসো না, হেসো না তুমি, বুদ্ধি-অভিমানী।
একবার মনে আনো, ওগো ভেদজ্ঞানী,
সে মহাদিনের কথা, যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতেছিল স্বজনবৎসলা
জন্মতপোবন হতে— সখা সহকার,
লতাভগ্নী মাধবিকা, পশুপরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে ; স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি পল্লবমর্মরে,
ছলছল মালিনীর জলকলস্বরে ;
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর
মঙ্গলবিদায়মন্ত্র গদ্‌গদগম্ভীর।
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন
নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন।

২ শ্রাবণ, ১৩০৩

দুই বন্ধু

মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্বাক্ হৃদয়,
তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়!
কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
সেদিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে ;
তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে
পরানে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বস্মৃতি,
অন্তরে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি,
মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে—
মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে।
যেন দুই ছদ্মবেশে দু বন্ধুর মেলা—
তার পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা।

২ শ্রাবণ, ১৩০৩

সঙ্গী

আরেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে।
একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে
একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্নবেলা
কবরী বাঁধিতেছিল বসিয়া একেলা।
পালিত কুকুরশিশু আসিয়া পিছনে
কেশের চাঞ্চল্য হেরি খেলা ভাবি মনে
লাফায়ে লাফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারম্বার।
বালিকা ভর্ৎসিল তারে গ্রীবাটি নাড়িয়া,
খেলার উৎসাহ তাহে উঠিল বাড়িয়া।
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জনী,
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গনি।
তখন হাসিয়া উঠি লয়ে বক্ষ'পরে
বালিকা ব্যথিল তারে আদরে আদরে।

২৩ চৈত্র, ১৩০২

সতী

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা।
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাতনামিনী
খ্যাতিহীনা কীর্তিহীনা কত-না কামিনী—
কেহ ছিল রাজসৌধে কেহ পর্ণঘরে,
কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অনাদরে ;
শুধু প্রীতি ঢালি দিয়া মুছি লয়ে নাম
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি মর্তধাম।
তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী—
মর্তে কলঙ্কিনী,স্বর্গে সতীশিরোমণি।
হেরি তারে সতীগর্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কী জানিবে বার্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্বকাহিনী।

২৪ চৈত্র, ১৩০২

স্নেহদৃশ্য

বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার
বহু বরষের রোগে অস্থিচর্মসার।
হেরি তার উদাসীন হাসিহীন মুখ,
মনে হয়, সংসারের লেশমাত্র সুখ
পারে না সে কোনোমতে করিতে শোষণ
দিয়ে তার সর্বদেহ সর্বপ্রাণমন।
স্বল্পপ্রাণ শীর্ণ দীর্ঘ জীর্ণ দেহভার
শিশুসম কক্ষে বহি জননী তাহার
আশাহীন দৃঢ়ধৈর্য মৌনম্লানমুখে
প্রতিদিন লয়ে আসে পথের সম্মুখে।
আসে যায় রেলগাড়ি, ধায় লোকজন—
সে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর অনাসক্ত মন
যদি পিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।

২৪ চৈত্র, ১৩০২

করুণা

অপরাহ্ণে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড় ; কর্মশালা হতে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
উর্ধ্বশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কষাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানির খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে চলে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি,
পাষাণকঠিন পথ উঠিল শিহরি।
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার,
স্বর্গে যেন দয়াদেবী করে হাহাকার
উর্ধ্বপানে চেয়ে দেখি, স্খলিতবসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

২৪ চৈত্র, ১৩০২

পদ্মা

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।
অবসান-সন্ধ্যালোকে আছিলে সেদিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন ;
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়ে ছিল তোমাপানে হাসিভরা মুখে।
সেদিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।

নানা কর্মে মোর কাছে আসে নানা জন,
নাহি জানে আমাদের পরানবন্ধন ;
নাহি জানে, কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন-পাতা নির্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাকদল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি কোলাহল,

যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্বতীরে
রুদ্ধ হয়ে যায় দ্বার কুটিরে কুটিরে,
তুমি কোন্ গান কর আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তার পায় নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
শত বার দেখাশুনা তোমায় আমায়।

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে,
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে—
কত গ্রাম, কত মাঠ, কত ঝাউঝাড়,
কত বালুচর, কত ভেঙে-পড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন?
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায়।

চৈত্র, ১৩০২

স্নেহগ্রাস

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্তি করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন-করিয়া তারে আগ্রহপরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।

২৫ চৈত্র, ১৩০২

বঙ্গমাতা

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি— তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তরমাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো-ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দসাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি ক'রে, মানুষ কর নি।

ত্র, ১৩০২

দুই উপমা

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে যেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোনোমতে ;
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ'পরে
তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতায় চরণ না সরে।

২৬ চৈত্র, ১৩০২

অভিমান

কারে দিব দোষ, বন্ধু, কারে দিব দোষ!
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ।
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালি।
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারি কাছে তারি'পরে তোমার নালিশ!
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ ক'রে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস নে ঢাক।
এক দিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্য দিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল!

চৈত্র, ১৩০২

পরবেশ

কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না 'ওরে দীন, যত্নে মোরে ধরো,
তোমার চর্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর'?
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তবে কালো বস্ত্র কলঙ্কনিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে।
বলিতেছে, 'যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়।'
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কী অহংকার।
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।

২৬ চৈত্র, ১৩০২

সমাপ্তি

যদিও বসন্ত গেছে তবু বারে বারে
সাধ যায় বসন্তের গান গাহিবারে।
সহসা পঞ্চমরাগ আপনি সে বাজে,
তখনি থামাতে চাই শিহরিয়া লাজে।
যত-না মধুর হোক মধুরসাবেশ
যেখানে তাহার সীমা সেথা করো শেষ।
যেখানে আপনি থামে যাক থেমে গীতি,
তার পরে থাক্ তার পরিপূর্ণ স্মৃতি।
পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়,
টানিয়া কোরো না ছিন্ন বৃথা দুরাশায়।
নিঃশব্দে দিনের অন্তে আসে অন্ধকার,
তেমনি হউক শেষ শেষ যা হবার।
আসুক বিষাদভরা শান্ত সান্ত্বনায়
মধুর মিলন-অন্তে সুন্দর বিদায়।

চৈত্র, ১৩০২

ধরাতল

ছোটো কথা, ছোটো গীত, আজি মনে আসে।
চোখে পড়ে যাহা কিছু হেরি চারি পাশে।
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী,
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
সবি বলে 'যাই যাই' নিমেষে নিমেষে—
ক্ষণকাল দেখি ব'লে দেখি ভালোবেসে।
তীর হতে দুঃখ সুখ দুই ভাইবোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে—
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে।
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুকনয়ানে
আমার পরান হতে ধরার পরানে—
ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো,
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

২৭ চৈত্র, ১৩০২

তত্ত্ব ও সৌন্দর্য

শুনিয়াছি নিম্নে তব, হে বিশ্বপাথার,
নাহি অন্ত মহামূল্য মণিমুকুতার।
নিশিদিন দেশে দেশে পণ্ডিত ডুবারি
রত রহিয়াছে কত অন্বেষণে তারি।
তাহে মোর নাহি লোভ, মহাপারাবার।
যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে,
যে মহিমা প্রসারিত তব নীল জলে,
যে সংগীত উঠে তব নিয়ত আঘাতে,
যে বিচিত্র লীলা তব মহানৃত্যে মাতে,
এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি,
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি,
তোমার অতলমাঝে ডুবিব তখন
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

২৭ চৈত্র, ১৩০২

তত্ত্বজ্ঞানহীন

যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

২৭ চৈত্র, ১৩০২

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি, নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

চৈত্র, ১৩০২

নারী

তুমি এ মনের সৃষ্টি, তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে,
মনে হয়, মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে,
মনে হয়, জন্ম-জন্ম আছ এ পরানে।
মানসীরূপিণী তুমি, তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্যসাথে যাও মিলে মিশে।
চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।
মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি,
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

২৮ চৈত্র, ১৩০২

প্রিয়া

শত বার ধিক আজি আমারে, সুন্দরী,
তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি।
তোমার মহিমাজ্যোতি তব মূর্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার 'পরে পড়ে নি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো
যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।
অপরূপ মায়াবলে তব হাসিগান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

চৈত্র, ১৩০২

ধ্যান

যত ভালোবাসি, যত হেরি বড়ো ক'রে
তত, প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে তত অল্প জানি—
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।
আজি এ বসন্তদিনে বিকশিতমন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব স্বপন—
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহাপারাবার ;
নাহি দিন, নাহি রাত্রি, নাহি দণ্ডপল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল ;
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া ;
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

২৮ চৈত্র, ১৩০২

মৌন

যাহা কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়,
মন বলে মাথা নাড়ি— এ নয়, এ নয়।
যে - কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে-কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম।
সে শুধু ভরিয়া উঠি অশ্রুর আবেগে
হৃদয়-আকাশ ঘিরে ঘনঘোর মেঘে ;
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বিদীর্ণ রেখায়
অন্তর করিয়া ছিন্ন কী দেখাতে চায়।
মৌন-মূক-মূঢ়-সম ঘনায়ে আঁধারে
সহসা নিশীথরাত্রে কাঁদে শতধারে।
বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ,
কোথায় হারায়ে এলি তোর যত গান।
বাঁশি যেন নাই, বৃথা নিশ্বাস কেবল!
রাগিণীর পরিবর্তে শুধু অশ্রুজল!

চৈত্র, ১৩০২

অসময়

বৃথা চেষ্টা রাখি দাও। স্তব্ধ নীরবতা
আপনি তুলিবে গড়ি আপনার কথা।
আজি সে রয়েছে ধ্যানে— এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গভয়ভীত তপোবন-সম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি, প্রিয়া,
বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া,
এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি—
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোনো গীতি।
শুধু এ মর্মরহীন বনপথ'পরি
তোমারি মঞ্জীর দুটি উঠিছে গুঞ্জরি।
প্রিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে,
কালিকার গান আজি আছে মৌন হয়ে।
তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

২৯ চৈত্র, ১৩০২

গান

তুমি পড়িতেছ হেসে
তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।
যৌবনসমুদ্রমাঝে
কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার।
উচ্ছল পাগল নীরে
তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে
কী খেলা তোমার।
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে
কত নৃত্যে, কত সুরে,
এস কাছে যাও দূরে
শতলক্ষ বার।
তুমি পড়িতেছ হেসে
তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার

জাগরণসম তুমি
আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।
সুষুপ্তির প্রান্ততীরে
দেখা দাও ধীরে ধীরে
নবীন কিরণে।
দেখিতে দেখিতে শেষে
সকল হৃদয়ে এসে
দাঁড়াও আকুলকেশে
রাতুলচরণে—
সকল আকাশ টুটে
তোমাতে ভরিয়া উঠে,
সকল কানন ফুটে
জীবনে যৌবনে।
জাগরণসম তুমি
আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।

কুসুমের মতো শ্বসি
পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ'পরে।
গোপন শিশিরছলে
বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।
নিঃশব্দ সৌরভরাশি
পরানে পশিছে আসি—
সুখস্বপ্ন পরকাশি
নিভৃত অন্তরে।
পরশপুলকে-ভোর
চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন মোর
সর্বাঙ্গে সঞ্চরে।
কুসুমের মতো শ্বসি
পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ'পরে।

২৯ চৈত্র, ১৩০২

শেষ কথা

মাঝে মাঝে মনে হয়, শতকথাভারে
হৃদয় পড়েছে যেন নুয়ে একেবারে।
যেন কোন্ ভাবযজ্ঞ বহু আয়োজনে
চলিতেছে অন্তরের সুদূর সদনে।
অধীর সিন্ধুর মতো কলধ্বনি তার
অতি দূর হতে কানে আসে বারম্বার।
মনে হয়, কত ছন্দ, কত-না রাগিণী,
কত-না আশ্চর্য গাথা, অপূর্ব কাহিনী—
যত কিছু রচিয়াছে যত কবিগণে
সব মিলিতেছে আসি অপূর্ব মিলনে ;
এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান।
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি,—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি।

৩০ চৈত্র, ১৩০২

বর্ষশেষ

নির্মল প্রত্যূষে আজি যত ছিল পাখি
বনে বনে শাখে শাখে উঠিয়াছে ডাকি।
দোয়েল-শ্যামার কণ্ঠে আনন্দ-উচ্ছ্বাস,
গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার নাহি মিটে আশ।
করুণ মিনতিস্বরে অশ্রান্ত কোকিল
অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল।
কেহ নাচে, কেহ গায়, উড়ে মত্তবৎ—
ফিরিয়া পেয়েছে যেন হারানো জগৎ।
পাখিরা জানে না কেহ আজি বর্ষশেষ ;
বকবৃদ্ধ-কাছে নাহি শুনে উপদেশ।
যতদিন এ আকাশে এ জীবন আছে,
বরষের শেষ নাহি তাহাদের কাছে।
মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি
আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।

চৈত্র, ১৩০২

অভয়

আজি বর্ষশেষদিনে, গুরুমহাশয়,
কারে দেখাইছ বসি অন্তিমের ভয়।
অনন্ত আশ্বাস আজি জাগিছে আকাশে,
অনন্ত জীবনধারা বহিছে বাতাসে,
জগৎ উঠেছে হেসে জাগরণসুখে,
ভয় শুধু লেগে আছে তব শুষ্ক মুখে।
দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মৃত্যুগ্রাস ;
প্রবঞ্চনা করি তুমি দেখাইছ ত্রাস।
বরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বল্প তাহে ক্ষতি,
ভয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি।
তিনি নিজে মৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসারকুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের।
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

৩০ চৈত্র, ১৩০২

অনাবৃষ্টি

শুনেছিনু, পুরাকালে মানবীর প্রেমে
দেবতারা স্বর্গ হতে আসিতেন নেমে।
সেকাল গিয়েছে। আজি এই বৃষ্টিহীন
শুষ্কনদী দগ্ধক্ষেত্র বৈশাখের দিন
কাতরে কৃষককন্যা অনুনয়বাণী
কহিতেছে বারম্বার, "আয় বৃষ্টি হানি।"
ব্যাকুল প্রত্যাশাভরে গগনের পানে
চাহিতেছে থেকে থেকে করুণ নয়ানে।
তবু বৃষ্টি নাহি নামে, বাতাস বধির
উড়ায়ে সকল মেঘ ছুটেছে অধীর;
আকাশের সর্বরস রৌদ্ররসনায়
লেহন করিল সূর্য। কলিযুগে, হায়,
দেবতারা বৃদ্ধ আজি। নারীর মিনতি
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি।

বৈশাখ, ১৩০৩

অজ্ঞাত বিশ্ব

জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে,
অসীম প্রকৃতি। সরল বিশ্বাসভরে
তবু তোরে গৃহ ব'লে মাতা ব'লে মানি।
আজ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি
প্রচণ্ড পিশাচীরূপে ছুটিয়া গর্জিয়া,
আপনার মাতৃবেশ শূন্যে বিসর্জিয়া
কুটি কুটি ছিন্ন করি, বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ংকরী ধূলিপক্ষ'পরে,
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন।
সভয়ে শুধাই আজি, হে মহাভীষণ,
অনন্ত আকাশপথ রুধি চারিধারে
কে তুমি সহস্রবাহু ঘিরেছ আমারে।
আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি।
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি।

২ বৈশাখ, ১৩০৩

ভয়ের দুরাশা

'জননী জননী' ব'লে ডাকি তোরে ত্রাসে
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে
শুনি আর্তস্বর। যদি ব্যাঘ্রিনীর মতো
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন।
নখর লুকায়ে ফেলি পরিপূর্ণ স্তন
যদি দাও মুখে তুলি, চিত্রাঙ্কিত বুকে
যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে।
এমনি দুরাশা! আছ তুমি লক্ষ কোটি
গ্রহতারা চন্দ্রসূর্য গগনে প্রকটি
হে মহামহিম। তুলি তব বজ্রমুঠি
তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি
আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্রপ্রাণ কোথা পড়ে আছি—
মা বলিয়া ভুলাইব তোমারে, পিশাচী!

শাখ, ১৩০৩

ভক্তের প্রতি

সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়,
কী গুণে তোমারে আমি করিয়াছি জয়
তাই ভাবি মনে। উৎফুল্ল উত্তান চোখে
চেয়ে আছ মুখপানে, প্রীতির আলোকে
আমারে উজ্জ্বল করি। তারুণ্য তোমার
আপন লাবণ্যখানি লয়ে উপহার
পরায় আমার কণ্ঠে— সাজায় আমারে
আপন মনের মতো দেবতা-আকারে
ভক্তির উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করি।
সেথায় একাকী আমি সসংকোচে মরি।
সেথা নিত্য ধূপে দীপে পূজা-উপচারে
অচল আসন'পরে কে রাখে আমারে!
গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি।
নহি আমি ধ্রুবতারা, নহি আমি রবি।

২১ আষাঢ়, ১৩০৩

নদীযাত্রা

চলেছে তরণী মোর শান্ত বায়ুভরে।
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগন্তশিয়রে।
বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট-অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়।
দুই কূলে স্তব্ধ ক্ষেত্র শ্যাম শস্যে ভরা,
আলস্যমন্থর যেন পূর্ণগর্ভা ধরা।
আজি সর্ব জলস্থল কেন এত স্থির।
নদীতে না হেরি তরী, জনশূন্য তীর।
পরিপূর্ণ ধরামাঝে বসিয়া একাকী
চিরপুরাতন মৃত্যু আজি ম্লান-আঁখি।
সেজেছে সুন্দর বেশে, কেশে মেঘভার,
পড়েছে মলিন আলো ললাটে তাহার।
গুঞ্জরিয়া গাহিতেছে সকরুণ তানে,
ভুলায়ে নিতেছে মোর উতলা পরানে।

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

মৃত্যুমাধুরী

পরান কহিছে ধীরে— হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর।
আজি মোর মনে হয়, এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য, সকলি তোমার।
মনে হয়, যেন তব মিলনবিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্বভুবনে।
প্রশান্ত করুণচক্ষে প্রসন্ন-অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব চরাচরে।
প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহবাঁশি উঠিতেছে বাজি ;
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

স্মৃতি

সে ছিল আরেক দিন এই তরী'পরে ;
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।
ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়
সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে।
পাশে বসি ব'লে যেত কলকণ্ঠকথা—
কত কী কাহিনী তার, কত আকুলতা।
প্রত্যূষে আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া
প্রভাতপাখির মতো জাগাতো আসিয়া।
স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়।
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে,
তাই ভাবিতেছি বসি সজলনয়ানে।

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

বিলয়

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোকহিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।
বরষার নদী'পরে ছলছল আলো,
দূরতীরে কাননের ছায়া কালো কালো,
দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি—
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাজি।
আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি,
"আজি প্রাতে সব পাখি উঠিয়াছে গাহি—
শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাতবায়ে
অনন্ত জগৎমাঝে গিয়েছে হারায়ে।"

৭ শ্রাবণ, ১৩০৩

প্রথম চুম্বন

স্তব্ধ হল দশ দিক নত করি আঁখি—
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখি।
শান্ত হয়ে গেল বায়ু— জলকলস্বর
মুহূর্তে থামিয়া গেল, বনের মর্মর
বনের মর্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।
নিস্তরঙ্গ তটিনীর জনশূন্য তীরে
নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায়
নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত নির্বাক ধরায়।
সেইক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জন
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।
দিক্‌দিগন্তরে বাজি উঠিল তখনি
দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি;
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুজল ভরি।

১০ শ্রাবণ, ১৩০৩

শেষ চুম্বন

দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।
উষার করুণ চাঁদ শীর্ণমুখচ্ছবি।
ম্লান হয়ে এল তারা ; পূর্ব-দিগ্বধূর
কপোল শিশিরসিক্ত পাণ্ডুরবিধুর।
ধীরে ধীরে নিবে গেল শেষ দীপশিখা ;
খসে গেল যামিনীর স্বপ্নযবনিকা।
প্রবেশিল বাতায়নে পরিতাপসম
রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্মম।
সেইক্ষণে গৃহদ্বারে সত্বর সঘন
আমাদের সর্বশেষ বিদায়চুম্বন।
মুহূর্তে উঠিল বাজি চারিদিক হতে
কর্মের ঘর্ঘরমন্দ্র সংসারের পথে।
মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে ;
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।

১০ শ্রাবণ, ১৩০৩

যাত্রী

ওরে যাত্রী, যেতে হবে বহুদূরদেশে।
কিসের করিস চিন্তা বসি পথশেষে—
কোন্ দুঃখে কাঁদে প্রাণ। কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি,
শুধু মুগ্ধ নেত্র মেলি। কার কথা শুনে
মরিস জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে।
কোথায় রহিবে পড়ি এ তোর সংসার।
কোথায় পশিবে সেথা কলরব তার।
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো—
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুরক্ষত।
নীরবে জ্বলিবে তব পথের দু ধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে।
তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে—
কোথা হতে কোথা গেছ না রহিবে মনে।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

তৃণ

হে বন্ধু প্রসন্ন হও, দূর করো ক্রোধ।
তোমাদের সাথে মোর বৃথা এ বিরোধ।
আমি চলিবারে চাই যেই পথ বাহি
সেথা কারো তরে কিছু স্থানাভাব নাহি।
সপ্তলোক সেই পথে চলে পাশে পাশে,
তবু তার অন্ত নাই মহান আকাশে।
তোমার ঐশ্বর্যরাশি গৃহভিত্তিমাঝে
ব্রহ্মাণ্ডেরে তুচ্ছ করি দীপ্তগর্বে সাজে
তারে সেই বিশ্বপথে করিলে বাহির
মুহূর্তে সে হবে ক্ষুদ্র ম্লান নতশির—
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নবতৃণদল
বরষার বৃষ্টিধারে সরস শ্যামল।
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ওগো অভিমান,
এ আমার আজিকার অতি ক্ষুদ্র গান।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

ঐশ্বর্য

ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
সরল মাহাত্ম্য লয়ে সহজে বিরাজে।
পুরবের নবসূর্য, নিশীথের শশী,
তৃণটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি।
আমার এ গান এও জগতের গানে
মিশে যায় নিখিলের মর্মমাঝখানে—
শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্মর,
সকলের মাঝে তার আপনার ঘর।
কিন্তু, হে বিলাসী, তব ঐশ্বর্যের ভার
ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বারে শুধু একাকী তোমার।
নাহি পড়ে সূর্যালোক, নাহি চাহে চাঁদ,
নাহি তাহে নিখিলের নিত্য-আশীর্বাদ।
সম্মুখে দাঁড়ালে মৃত্যু মুহূর্তেই হায়
পাংশুপাণ্ডু শীর্ণ ম্লান মিথ্যা হয়ে যায়।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

স্বার্থ

কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক—
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ,
লুকায় অনন্ত সত্য ; স্নেহ সখ্য প্রীতি
মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি ;
থেমে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন
তোর তুচ্ছ পরিহাসে। ওগো বন্ধুগণ,
সব স্বার্থ পূর্ণ হোক। ক্ষুদ্রতম কণা
ভাণ্ডারে টানিয়া আনো— কিছু ত্যজিয়ো না।
আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখানি
জাগিছে যাহার মুখে অনন্তের বাণী
অমৃতে অশ্রুতে মাখা। মোর তরে থাক্
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক্।
থাক্ মহাবিশ্ব, থাক্ হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

প্রেয়সী

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা ; মাথার উপর
সদ্যস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর
রাখিয়াছে স্নিগ্ধ হস্ত আশীর্বাদে ভরা ;
সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা
বুলায় নয়নে মোর অমৃতচুম্বন ;
উতলা বাতাস আসি করে আলিঙ্গন ;
অন্তরে সঞ্চার করি আনন্দের বেগ
বহে যায় ভরা নদী ; মধ্যাহ্নের মেঘ
স্বপ্নমালা গাঁথি দেয় দিগন্তের ভালে।
তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে,
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা—
বীণাস্বরে রচি দিলে মহানীরবতা।

১ শ্রাবণ, ১৩০৩

শান্তিমন্ত্র

কাল আমি তরী খুলি লোকালয়মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে—
হে অন্তর্যামিণী দেবী, ছেড়ো না আমারে,
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতাপাথারে
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্ব ঝঞ্ঝনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি যবে রক্ত টেনে আনে,
তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে মম।
বিরোধ উঠিবে গর্জি শতফণা ফণী,
তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি—
'স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা' বোলো কানে কানে,
'আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।'

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

কালিদাসের প্রতি

আজি তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী— কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস— রাজ-অধিরাজ।
কোনো চিহ্ন নাহি কারো। আজ মনে হয়,
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনাগান— গীতিসমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া'পরে।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

কুমারসম্ভবগান

যখন শুনালে, কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান— চারিদিকে ঘিরে
দাঁড়ালো প্রমথগণ ; শিখরের 'পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর,
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত ;
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে— যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ননিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

১৫ শ্রাবণ, ১৩০৩

মানসলোক

মানসকৈলাসশৃঙ্গে নির্জন ভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দিরপ্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি, কবি কালিদাস,
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধনীলভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে,
জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষির তপোলোকতলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি ;
চিরদিন রবে সেথা, ওহে কবিপতি,
শংকরচরিতগানে ভরিয়া ভুবন।—
মাঝে হতে উজ্জয়িনী রাজনিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।

১৫ শ্রাবণ, ১৩০৩

কাব্য

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত,
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো,
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভাষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর— নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে ; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ-দৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

১১ শ্রাবণ, ১৩০৩

প্রার্থনা

আজি   কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত—
তব   চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত   নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্ম্মমাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণমন পীযূষপরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি   কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম-পরান-বল্লভ।
চিতে   চিরসুধা করে সঞ্চার তব
সকরুণ করপল্লব।
হেথা   কত দিনে রাতে অপমানঘাতে
আছি নতশির গঞ্জিত,
তবু   চিত্তললাট তোমারি স্বকরে
রয়েছে তিলকরঞ্জিত।
হেথা   কে আমার কানে কঠিন বচনে
বাজায় বিরোধঝঞ্ঝনা।

প্রাণে দিবসরজনী উঠিতেছে ধ্বনি
তোমারি বীণার গুঞ্জনা।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্,
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত।
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাকো থাকো, চিরবাঞ্ছিত।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

ইছামতী নদী

অয়ি তন্বী ইছামতী, তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটিরে কুটিরে—
শস্যে পূর্ণ হোক ক্ষেত্র তব তটদেশে।
বর্ষে বর্ষে বরষায় আনন্দিত বেশে
ঘনঘোর-ঘটা-সাথে বজ্রবাদ্যরবে
পূর্ববায়ু-কল্লোলিত তরঙ্গ-উৎসবে
তুলিয়া আনন্দধ্বনি দক্ষিণে ও বামে
আশ্রিত পালিত তব দুই-তট-গ্রামে
সমারোহে চলে এস শৈলগৃহ হতে
সৌভাগ্যে শোভায় গর্বে উল্লসিত স্রোতে।
যখন রব না আমি, রবে না এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চারিয়া প্রাণ
তোমার আনন্দগাথা এ বঙ্গে, পার্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইছামতী।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

শুশ্রূষা

ব্যথাক্ষত মোর প্রাণ লয়ে তব ঘরে
অতিথিবৎসলা নদী কত স্নেহভরে
শুশ্রূষা করিলে আজি— স্নিগ্ধ হস্তখানি
দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে সুধা দিল আনি।
সায়াহ্ন আসিল নামি, পশ্চিমের তীরে
ধান্যক্ষেত্রে রক্ত রবি অস্ত গেল ধীরে।
পূর্বতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা,
জ্বলন্ত দিগন্তে শুধু মসীপুঞ্জরেখা;
সেথা অন্ধকার হতে আনিছে সমীর
কর্ম-অবসানধ্বনি অজ্ঞাত পল্লীর।
দুই তীর হতে তুলি দুই শান্তিপাখা
আমারে বুকের মাঝে দিলে তুমি ঢাকা।
চুপি চুপি বলি দিলে, "বৎস, জেনো সার,
সুখ দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার।"

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

আশিস্‌গ্রহণ

চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে।
সংসারবিপ্লবধ্বনি আসে দূর হতে।
বিদায় নেবার আগে, পারি যতক্ষণ,
পরিপূর্ণ করি লই মোর প্রাণমন
নিত্য-উচ্চারিত তব কলকণ্ঠস্বরে
উদার মঙ্গলমন্ত্রে— হৃদয়ের ’পরে
লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণসঞ্চয়
এই আশীর্বাদ করো, জয়পরাজয়
ধরি যেন নম্রচিত্তে করি শির নত
দেবতার আশীর্বাদী কুসুমের মতো।
বিশ্বস্ত স্নেহের মূর্তি দুঃস্বপ্নের প্রায়
সহসা বিরূপ হয়— তবু যেন তায়
আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার,
আমি যেন আমি থাকি নিত্য আপনার।

১৪ শ্রাবণ, ১৩০৩

বিদায়

হে তটিনী, সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মতো ; উদার গগন,
অলিখিত মহাশাস্ত্র, নীল পত্রগুলি
দিক হতে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি ;
শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্জনে
সত্যের স্বরূপখানি নির্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি ; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীতশিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজি লইতে বিদায়
তোমা-সবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত আলিঙ্গনে
নির্জনলক্ষ্মীরে। শুভশান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব।

১৪ শ্রাবণ ১৩০৩
